International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.01-09
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
10.29032/ijhsss.vol.10.issue.04W.001

রবীন্দ্রচিন্তায় জনশিক্ষার আঙ্গিকে আত্মশক্তির বিকাশ ও স্বাধীন চেতনার জাগরণ: একটি পর্যালোচনা

অনন্যা সরকার
গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Life of philosophy and educational concept of Rabindranath was closely involved.

Looking at the controversial problem of homeland as well as human society, the source of experience that he has obtained through his unrelenting search and survey is that it is possible to strike at the core of the problems in the way of pursuing the liberation of the heart through sadhana.

Original intellect is the only way and this awakening can come only through the appropriate education. He realized that only the upper and middle class people of the country were getting the opportunity to get education in the system introduced by the English.

Majority of people especially poor working people living in villages are deprived from the light of education.

He thinks that to improve the way of life of these people, all the facilities should be provided along with their education. He wanted to prepare the foundation of Gonzagaran through public education. He thinks that education can developed the individual's self power and awaken independent consciousness. He gave utmost importance to education in the rural development programme.

In his educational thought, enlightenment of the mind and emergence of power both gained importance. He strove throughout his life to implement his educational thought in the field of values education, applied studies and rural reconstruction through the institution like Viswa Bharati, Shantiniketan, Srinekatan for the welfare of human society.

Keywords: Rabindranath, Public Education, Self Strength, Independent Thinking, Human Development.

ভূমিকা: ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সমাজসংস্কারকগণ যখন দেশের বাহ্যিক কাঠামোর সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বর্হির্বিকৃতিকেই যথাসর্বস্ব বলে মনে করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন স্বদেশের বর্হির্বিকৃতির

কারণ হিসেবে দেশবাসীর অন্তরের বিভ্রান্তি, অজ্ঞতা ও মোহগ্রস্থতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই জনগণের চেতনার জাগরণ ঘটানো সম্ভব।

শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা গড়ে ওঠার পশ্চাতে একদিকে যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল তেমনি তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' এবং ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'নামক বিদ্যালয় দ্বারা কলকাতায় বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনা রবীন্দ্রনাথের অন্তরে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টি গুরুত্বলাভ করেছিল। এছাড়া জমিদারির দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে পল্লীজীবনের সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা,অভাব- অভিযোগ তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামের গরীব মানুষদের অজ্ঞতার সুযোগে মহাজনেরা তাদের অবজ্ঞা ও শোষণ করে চলেছে। এই অজ্ঞতা দূর করা এবং এদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মন হতে অজ্ঞানতা দূর হলেই মানুষ নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হবে, আত্মমর্যাদা ফিরে পাবে, তখনই সমাজ হতে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কার-কুপ্রথা ধীরে ধীরে দূরীভূত হয়ে সমাজের তথা দেশের উন্নতি ঘটবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে তাঁর 'শিক্ষার হেরফের', 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', 'বিশ্বভারতী', 'শিক্ষা সমস্যা', 'শিক্ষা সংস্কার', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি প্রবন্ধ হতে আমরা জানতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। এখানে রবীন্দ্রনাথের জনশিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনার বিভিন্ন দিক, তাঁর শিক্ষাচিন্তায় কিভাবে জনগণের আত্মশক্তির বিকাশ ও স্বাধীন চেতনার জাগরণ নিহিত, সেই সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা রাখা হলো।

জনশিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও উদ্যোগ প্রসঙ্গে আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষেপে তাঁর শিক্ষা ভাবনা ক্রমবিবর্তন কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলো---

প্রথম পর্যায় (১৮৯২-১৯০৪): এই সময়কালকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ গঠনের প্রথম যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি এই সময় ব্রিটিশ প্রবর্তিত প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেন। প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন আশ্রমে আদর্শ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও আত্মকর্তৃত্বের চর্চা করা সম্ভব--- এই ভাবনা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মেনে চলেছিলেন। (সিংহ, ২০১১, পৃষ্ঠা -৩৪)

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯০৫-১৯১৫): এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ও স্বদেশচিন্তার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৫ সালের ২২ শে অক্টোবর বাংলার মুখ্য সচিব টমাস কার্লাইল একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল কোন কলেজ যদি সরকারি আদেশ লঙ্ঘন করে এবং শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেয় তবে সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে সহায়তা করবে না। মূলত স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্র -শিক্ষকদের যোগদান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 'কার্লাইল সার্কুলার' জারি করা হলে বিদেশী শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়--- যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঐক্যমত প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি তপোবন ও আশ্রমশিক্ষার পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য

দিয়ে মানুষের মন গঠন, শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের আদর্শ রূপ কল্পনা, সংকীর্ণ মানসিকতার পরিহার, মন গঠনে জাতীয় চেতনার সীমাবদ্ধতা ও বিশ্বজনীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

তৃতীয় পর্যায় (১৯১৬-১৯৩৩): রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই পর্বে **১৯২১** সালে বিশ্বভারতীর রূপায়ণের মাধ্যমে একাধারে তিনি জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, সমবায়নীতির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। এই পর্বেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে সমাজের কেন্দ্রস্থল অধিকার করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ও জ্ঞানকে সমাজের উন্নতিসাধনের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন। আবার **১৯২২** সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ সুরুল গ্রামে পল্লী উন্নয়ন বিভাগের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে যার নাম হয় 'শ্রীনিকেতন'। 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি গ্রামোন্নয়ন, ব্যবহারিক বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির একটি স্থায়ী কেন্দ্রের পত্তন করেছিল।

চতুর্থ পর্যায় (১৯৩৩-১৯৪১): এই সময়কালে তিনি জনশিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন ও শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত করার ব্যর্থতা নিয়ে মতপ্রকাশ করেছেন। শিক্ষাব্যবস্থায় যে অসাম্য জড়িত রয়েছে তা দূরীভূত করে শিক্ষাকে সমাজের অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন। এই পর্বেই তিনি পল্লীপুনর্গঠনের সঙ্গে শিক্ষার বিকিরণের চিন্তাকে রূপদানের সাথে সাথে দেশীয় ক্ষুদ্রশিল্পের চর্চা, সংরক্ষণ ও প্রসারের বিষয়গুলিকেও শিক্ষার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। (সিংহ, ২০১১, পৃষ্ঠা - ৩৬)

জনশিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও গৃহীত উদ্যোগসমূহ: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে প্রকৃতির সংস্পর্শে শিক্ষালাভের বিষয়টি গুরুত্বলাভ করেছিল তেমনি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবহারিক বিদ্যানুশীলনের উপর গুরুত্ব দান করেছিলেন। তবে তিনি তাঁর সমসাময়িক প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ইংরেজ সরকার এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করে যার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার সুবিধার্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু মানুষকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে অনুগত কেরানীতে পরিণত করা। এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্খা বা ভারতীয় জীবনাদর্শের পটভূমিকায় গড়ে ওঠেনি। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় জীবন গঠনের বদলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রস্তুত করাই হয়ে উঠেছিল মূল লক্ষ্য।এই শিক্ষার সাথে জীবনের কোন যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বলেন--- 'আমাদের তরফে একটা কথা বলবার আছে, ইংরেজের শাসনে যতই দাক্ষিণ্য থাক্, আজ পর্যন্ত না মিলল আমাদের উপযুক্ত শিক্ষা, না জুটল যথেষ্ট পরিমাণে পেটের ভাত, না ঘটল স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা।' (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ১৯৬)

সমকালীন আর্থ -সামাজিক ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয়গণ ইংরেজ নির্ধারিত লক্ষ্যকেই সামনে রেখে শিক্ষার কাজকর্মে অগ্রসর হতেন। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত ভারতীয়দের জীবনে প্রশিক্ষণধর্মী এই শিক্ষাব্যবস্থা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত মানবিক আদর্শে গড়ে ওঠা ও সাধারণ মানুষজনের উপযোগী দেশীয় শিক্ষার বুনিয়াদ ক্রমশ উপেক্ষিত হতে শুরু করে। শহরে বসবাসকারী ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ গ্রামের মানুষদের অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করে এবং নিজেদের আলাদা গোত্রের মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। ফলে গ্রাম ও শহরের তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে বিরাট একটা ব্যবধান তৈরি হতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ সর্বজনীন শিক্ষা ও সাধারণ জনগণের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতেন। পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ জীবন-নির্বাহের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা যাতে পল্লীবাসীর কাছে উপলব্ধ হয় সেই কথায় তিনি তাঁর 'সমবায়নীতি'-তে উল্লেখ করেন। তিনি গ্রামে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন তার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো শিক্ষার প্রসার। তাই শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৩৩ সাল নাগাদ বীরভূমের সাঁওতালদের জন্য পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সমাজের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্গের শিশুদের জন্য আরও পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৩৬ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' বিষয়ে যে ভাষণ দেন তাতে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিক্ষা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের শিক্ষার প্রয়োজনের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছিল। (দত্ত, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ৯-১০)

রবীন্দ্রনাথের মতে, সর্বজনীন শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো ভাষা। কারণ ইংরেজ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। তিনি উপলব্ধি করেন যে সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে গেলে মাতৃভাষায় পাঠদান করার উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি যুক্তি দেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা করলে সেটি যেমন সহজবোধ্য হয় তেমনি শিক্ষণীয় বিষয় অনুধাবন করতে কোন ধরনের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না। এই সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত হলো---'বিদ্যা বিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশি মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছাতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফতানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যাবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।' (ঠাকুর, ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ১৮৯)

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য ও বিদেশের ইতিহাস,ভূগোল,বিজ্ঞান। সেখানে নিজের দেশকে জানার কোন অবকাশ ছিল না। তিনি ছাত্রদের চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা,কল্পনাশক্তির বিকাশ ও শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্যবিধানের উপায় হিসেবে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষায় রচিত বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠের পরামর্শ দিলেও সমকালীন ব্যবস্থায় এই সমস্ত গ্রন্থাবলী ছিল খুবই দুর্লভ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর সভায় ছাত্রদের তথা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এই শিক্ষার আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয় তথা বিশ্বভারতীতে এবং শিক্ষাসত্রে।

তিনি নারীশিক্ষাকেও পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন---'বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।' (ঠাকুর, ১৯৬০, পৃষ্ঠা -১৭৩)

রবীন্দ্রনাথ গ্রামের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বিকাশের জন্য গ্রামে প্রচলিত লোকশিক্ষার চিরাচরিত অবরুদ্ধ মাধ্যমগুলির ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। এই অবরুদ্ধ মাধ্যমগুলির মধ্যে যাত্রা, কথকতা লৌকিক পালাগান, পাঁচালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মাধ্যমে দেশের অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার বিকাশ ঘটানো যায়। তাঁর 'ইতিহাস কথা' প্রবন্ধ হতে জানা যায়---'কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। এমনকি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তার চেয়ে অনেক ভাল করিয়াই শেখানো যাইতে পারে।....আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস এমন কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোক শিক্ষা বিধান করিতে হইবে। (ঠাকুর,১৩৬২, পৃষ্ঠা -১৫৮)

শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির মিলনে যে শিক্ষা হয়, রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'জাগরী শক্তি'। অর্থনীতি যদি সভ্যতার 'অন্ন' রূপ হয়, তাহলে সভ্যতার 'জাগরণী' রূপ হল শিক্ষা। এই শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মনের আলো, প্রাণের খাদ্য, পিপাসার জল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিদ্যাসমবায়ের ভাবনা। এই ভাবনা মানুষের মনের জানালা খুলে দেয়। বিশ্বমানবের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করে। (দত্ত, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ২৬)

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদানের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আদিভৌতিক বিদ্যার প্রয়োজনীয়তাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে বলেছেন----'পূর্ব ও পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে।.... এই মিলনের অভাবে পূর্ব দেশ দৈন্যপীড়িত, আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।' (ঠাকুর,১৯৬০, পৃষ্ঠা - ২৪৬)
তিনি আরো বলেন--- 'এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব পশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।... সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনে বাধা নেই।[' (ঠাকুর, ১৯৬০, পৃষ্ঠা- ২৫১)

আত্মশক্তির বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা: রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় এককের পূর্বে সমগ্র গুরুত্বলাভ করেছে। পাশ্চাত্যে যেভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ব্যক্তিকে সমাজের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে সমাজের উন্নতিসাধনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির উন্নতিসাধনের কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি বলেন---'বিদ্যা বলো, টাকা বলো, প্রতাপ বলো, ধর্ম বলো, মানুষের যা কিছু দামী এবং বড়ো তাহা মানুষ দল বাঁধিয়াই পাইয়াছে।' (ঠাকুর, ১৩৬০, পৃষ্ঠা- ৬)

শিক্ষাপ্রসারের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সর্বজনীন জনশিক্ষাই গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাকর্মসূচি শুধুমাত্র সমাজের উঁচুস্তরের মানুষের জন্য সহজলভ্য ও বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর নাগালের বাইরে, সেই ব্যবস্থায় কোন সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। উপরন্তু সমাজ নিশ্চিতভাবে আত্মবিচ্ছেদের ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি উপলব্ধি করেন সমাজে পারস্পরিক সংঘাত ও বিদ্বেষের জন্ম হয় অশিক্ষার অন্ধকার থেকেই। তাই শিক্ষা ছাড়া দেশকে জাগ্রত করবার অন্য কোন উপায় নেই---জ্ঞানের আলোই পারে জাতীয় জীবনের তামসিকতাকে দূর করতে। তাঁর 'সমাধান' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ----'আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপর সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সংকীর্ণ। এই

জন্য সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে; আত্মশক্তির দিকে উন্মুক্ত রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাচরিত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়, তারপরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধ বিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় সহজে ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলে আফিঙের ঘুম ঘুমোই...কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না। দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে।' (ঠাকুর, ১৮২৫, পৃষ্ঠা - ২৪৯)

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রগতি অথবা মুক্তি একান্তভাবে বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা আসতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন অন্তরের প্রস্তুতি, আত্মশক্তির জাগরণ। জীবনের যা কিছু মহত্তম তা আমাদের মানস প্রকৃতির মধ্য থেকেই বিকশিত হয়। তিনি 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে বলেন --- 'যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তর- প্রকৃতিতে, এই জন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞান, বুদ্ধিতে, প্রেমে, কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ।....মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি, এই জন্যই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি--- আত্মার প্রকাশ।' (ঠাকুর, ১৪২৫, পৃষ্ঠা - ১৯৩)

মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনে তিনটি দাবি পূরণ হওয়া আবশ্যক। রুজি রোজগার বা জীবন জীবিকার দাবি, সামাজিক দাবি এবং মনুষ্যত্বের দাবি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় আত্মশক্তি বিকাশের সোপান হিসেবে যেমন জীবিকা অর্জনের দাবি গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে চেতনাবোধ, মনুষ্যত্বের বিকাশ, মানবিক শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। এই মানবিক শিক্ষার ধারাটি মূলত জ্ঞান, মূল্যবোধ, সৃজনের ধারা। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে জীবন- জীবিকার সন্ধানে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করা শুরু করার ফলে গ্রামগুলি পিছিয়ে পড়ছে। এদিকে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পল্লীগ্রামে বসবাস করে। তাই দেশের উন্নয়নের জন্য পল্লীগুলির পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। সুবীর চন্দ্র কর এ প্রসঙ্গে বলেন---'তাদের (পল্লীবাসী জনগণের) শিক্ষাদীক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও বক্তৃতার ব্যবস্থা, লোক -শিক্ষার সহাবস্থান, আর্থিক উন্নতির জন্য কৃষি, কুটির শিল্প ও সমবায় ধনভাণ্ডার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যসমিতি, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং কিশোরদের সেবা, শৃঙ্খলা ও খেলাধূলার কাজের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য ব্রতীদল প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নানা উদ্যোগ করে গেছেন। তাঁর মতে একটি পল্লীকেও যদি একস্থানে সর্বাঙ্গিন উন্নতিতে আদর্শ পল্লী করে গড়ে তোলা যায়, তবে তার থেকেই দেশের বৃহত্তম কল্যাণের সূচনা হবে।' (কর, ১৩৫৫, পৃষ্ঠা - ৩)

স্বাধীন চিন্তাশক্তির জাগরণে শিক্ষা: রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে ঐকান্তিকভাবে অন্তরের সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যে শিক্ষা কেবলমাত্র পেশাদারিত্ব অর্জনে সহায়তা করে কিন্তু জীবন গঠন করতে পারেনা সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছেন---'আমরা যে শিক্ষায় অজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, সে সিন্দুকের মধ্যেই যে আপিসের শামলা এবং তাদের ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যা তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নেই--- ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর গুনে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে'। (ঠাকুর, ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ১৬)

রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার সাথে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বামীজী মনে করেন, যে শিক্ষা মানুষের চেতনা জাগরণ ঘটাতে অসমর্থ্য, দৈহিক জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত করে গড়ে

তুলতে অক্ষম সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তিনি বলেন---'তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরি এই তো! এতে তোদেরই বা কি হল আর দেশেরই বা কি হল।' (স্বামী বিবেকানন্দ, ১৪২৮, পৃষ্ঠা - ৪৯)

ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথিনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই বিদ্যা ছিল নিষ্প্রাণ, গতানুগতিক ও যান্ত্রিক প্রকৃতির। এই বিদ্যা মানুষকে জীবিকার সন্ধান দিলেও মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীল ভাবনার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। মনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ বিপর্যস্ত হয় রবীন্দ্রনাথ 'তোতাকাহিনী'-র মুখ্য চরিত্র তোতাপাখিটির মাধ্যমে যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা হতে আগত প্রতিবন্ধকতা ও তার ফলাফল সম্পর্কে বোঝাতে চেয়েছেন। খাঁচায় বন্দি তোতাপাখিটির শিক্ষা নিয়ে রাজা, মন্ত্রী ও রাজার ভাগ্নেদের আয়োজনের অন্ত নেই, এই আয়োজনের বর্ণনানুসারে আমরা জানতে পারি---'রাজা বুঝিলেন আয়োজনে ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।' (ঠাকুর, ১৯২২, পৃষ্ঠা- ৯২)

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজদের খুশি ও বদান্যতার উপর নির্ভর করত। ফলে জাতির বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানচর্চাও হয়ে উঠেছিল পরাধীনতার শিকার। শিক্ষা বিষয়ে এই পরমুখাপেক্ষীতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন---'নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরি করার বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবতঃ স্বজাতিকে স্বাতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য।' (ঠাকুর, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-৪৩)

স্বাধীন শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া স্বাধীন বিকাশের অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরমুকাপেক্ষিতা শুধু দাস সৃষ্টি করে। স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকশিত করে না। চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনে অক্ষম হলে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যায়।

জাতীয় জীবনের সব রকম দুঃখ দুর্দশার মূলে রয়েছে বিভেদবোধের সমস্যা। সমাজে, ধর্মে, সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্রে ---জীবনে চলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্নতা লক্ষ্য করি যা মনে বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, বিভেদবোধের জন্ম দেয়। এই ভেদবুদ্ধির অনিবার্য পরিণতি হিসেবে আত্মবিচ্ছেদ জনগণের জীবনকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। বাহ্যবিভেদ প্রকৃত সমস্যা নয়। বাহ্যবিভেদ ও সংঘাতের মূলে আছে অন্তরের অনৈক্য যাকে বাহ্যিক প্রলেপের মাধ্যমে বেশিদিন চেপে রাখা সম্ভব নয়। একমাত্র আন্তরিক ঐক্যস্থাপনের মাধ্যমে সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা, সংঘাতের মত অসঙ্গতিকে দূর করা সম্ভব। এই অন্তরের ঐক্য শুধু স্বাধীন চিন্তাশক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মননশীল মানসিকতাকে আশ্রয় করে যে সংহতি গড়ে ওঠে সেই সংহতিই সকল বিরুদ্ধশক্তির আঘাত ও আক্রমণকে পর্যদস্ত করে টিকে থাকতে পারে তাহলে জাতীয় জীবনে একটি সংগঠনশীল ভূমিকা গড়ে উঠতে পারে। অন্ধ কুসংস্কার ও কুপ্রথায় আচ্ছন্ন মনে বিভেদের বুনিয়াদ নানা আকার ও রূপে পাকা হয়ে বসে আছে। বিভেদকামী শোষণজীবীরা সেই সুযোগকেই পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। দেশের সবচেয়ে বড় অভাব হল চিত্তশক্তির। দেশের সর্বাগ্রে বেশি প্রয়োজন মোহমুক্ত মন। মানবজীবনের যে কোন সমস্যার সমাধানে অন্তরের সমৃদ্ধির সর্বাধিক প্রয়োজন।

তিনি তাঁর ‘স্বরাজসাধন’ প্রবন্ধে বলেন ---- ‘আমাদের দেশের এই সকল সমস্যা আন্তরিক বলেই এত দুরূহ। বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, এই কারণে একটা অত্যন্ত সহজ বাহ্যিক প্রণালীর কথা শুনলেই আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। (ঠাকুর, ১৪২৫, পৃষ্ঠা- ২৭৩)

উপসংহার: সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রের সমস্যার মূলে রয়েছে আমাদের জ্ঞানের দীনতা। তাই শিক্ষা ব্যতীত দেশকে জাগ্রত করার অন্য কোন উপায় নেই। জ্ঞানের আলোই পারে জাতীয় জীবনে অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূরীভূত করতে। মানবসত্তার অন্তর্নিহিত মুক্ত শুদ্ধ স্বরূপটি জ্ঞানের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ ও স্বাধীন চেতনা জাগরণে সক্ষম। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে তার সেই অনুভবকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি আজীবন সক্রিয় ছিলেন।

শিক্ষাপ্রসারে রবীন্দ্রনাথ জনশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। অশিক্ষার অভিশাপ থেকে আপামর জনতাকে মুক্ত করতে না পারলে সমাজের সব স্তরের মানুষকেই পারস্পরিক সংঘাত ও বিদ্বেষের আঘাত জর্জরিত করবে। জীবন -জীবিকার প্রয়োজনে ও সুস্থ সমাজজীবনের সঙ্গে সৃজনশীল ও সার্থক অভিযোজনের ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে মনুষ্যত্বের জাগরণের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে আত্মকেন্দ্রীকতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ভোগপ্রমত্ততার কথা বলা যায়। এগুলি থেকে মুক্ত হতে শিক্ষার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক।

ইংরেজি শিক্ষার সমালোচনা করলেও পাশ্চাত্যের তথা বিশ্বের বিদ্যা ও সংস্কৃতিপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কথা তিনি বলেননি। দেশের বিদ্যা ও সংস্কৃতির সাথে জগতের বহুমুখী বিদ্যা ও সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকগুলি গ্রহণ করার কথা বলেছেন। শিক্ষা ও মানুষের আত্মপরিচয়বোধ থেকে সমাজবোধ, সমাজবোধ থেকে স্বদেশবোধ এবং স্বদেশবোধ থেকে বিশ্ববোধে উন্নীত হওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যাসমবায়ের ভাবনায় ব্যক্ত করেছেন যা আজকের দিনের সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথের সময়কালের সমস্যাগুলি আজও বিদ্যমান, তাদের চরিত্রের স্বরূপ ও ব্যাপ্তির পরিমাণগত পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও দেখা যাচ্ছে যে ঔপনিবেশিক ভারতের মত এখনো শিক্ষাকে জীবিকানির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণ হিসেবেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ও শিক্ষার সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্যেগুলি উপেক্ষিত হয়। শুধুমাত্র উপার্জনের যন্ত্র হিসেবে অথবা দক্ষ উৎপাদনের উপাদান হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলাই হয়ে গেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য। জনগণ শিক্ষিত হলেও তাদের আত্মোপলব্ধির ক্ষমতা ও চেতনা জাগরিত হয়নি, ফলে দেশে শিক্ষিতের হার কাগজে-কলমে বৃদ্ধি পেলেও মানুষের জীবনের শান্তি ও উন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। জাতপাতের সমস্যা, সাম্প্রদায়িকতার মত সামাজিক ব্যাধির কারণে আজও সমাজ অবক্ষয়ের মুখে পতিত হয়েছে। এমতাবস্থায় শিক্ষায় জ্ঞানরূপ ও কর্মরূপের মধ্যে ভারসাম্যরক্ষা ও উভয়ের সুসংগত সমন্বয়ের প্রয়োজন। তবেই সমাজ তথা দেশের উন্নতি সম্ভব হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৬০) *শিক্ষা,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
2) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৬২) *পল্লীপ্রকৃতি,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

3) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬০) *সমবায়নীতি,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী
4) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৯) *স্বদেশী সমাজ,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী
5) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪২৫) *কালান্তর,* কলকাতা, বিশ্বভারতী
6) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬২) *ইতিহাস,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
7) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯২২) *লিপিকা,* এলাহবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড
8) সিংহ, দীক্ষিত (২০১১) *রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুনর্গঠন-প্রয়াস,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি।
9) কর, সুবীরচন্দ্র (১৩৫৫) *জনগণের রবীন্দ্রনাথ,* কলিকাতা, সিগনেট প্রেস
10) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার (২০২২) *রবীন্দ্র জীবনকথা,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
11) দত্ত, জ্যোতির্ভূষণ (২০১৩) *সময়ের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ,* কলকাতা, পুনশ্চ
12) স্বামী বিবেকানন্দ (১৪২৮) *শিক্ষাপ্রসঙ্গ,* কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়
13) মজুমদার, আদিত্যপ্রসাদ (১৯৭৪) *চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ,* কলকাতা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি
14) সেন, প্রবোধচন্দ্র (১৩৬৮) *রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা,* কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড